তারিখ 04 APR 2016

কারা গ্রন্থাগার : দুঃসময়ের স্নিগ্ধ সাহচর্য

ড. মো. আনোয়ার হোসেন

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা এসে শুরুতেই দুটি কাজ করেছে– একটি হচ্ছে খাজনা বা কর আদায়ের জন্য তৎকালীন জেলা পর্যায়ে কালেকটরেট প্রতিষ্ঠা; আরেকটি হচ্ছে কারাগার। আমি প্রথম কারাগারে যাই ১৯৭৬ সালে, রাজবন্দি হিসেবে। আমাকে মার্চ মাসেই আটক করা হয়েছিল, কারাগারে পাঠানো হয় জুন মাসে। তারপর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত লম্বা একটি সময় কেটেছে কারাগারে। এর একটি বড় অংশ কেটেছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। দ্বিতীয় দফা কারাগারে যাই ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সূত্র ধরে। ওই সময়ে রিমান্ড ও কারাভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল আমার বই 'কাঠগড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি'। সেখানে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ডেটলাইনে লিখেছিলাম– '১৯৭৬-এ কারাগারে থাকাকালে এই এলাকায় ছিলাম। প্রধানত পুরাতন ২০ সেলে। আজও তেমনই আছে। প্রবাদ আছে, একবার কারাবাস হলে অন্তত আরও একবার আসতে হয়। আমার ক্ষেত্রে তা সত্য হলো।'

প্রথম দফা কারাভোগের সময় প্রথমদিকে আমিসহ রাজবন্দিদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। পরে আমরা এক কক্ষে বা পাশাপাশি থাকার জন্য দাবি জানিয়েছি, আন্দোলন করেছি। কারা কর্তৃপক্ষ চাপের মুখে তা মেনে নিয়েছিল। আমরা সবাই মিলে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুযোগ করে নিয়েছিলাম, সবাই যেন কারা গ্রন্থাগারের বই পড়তে পারি। এর মধ্য দিয়ে এক নতুন জগৎ খুলে গিয়েছিল আমাদের সামনে। ওই গ্রন্থাগার খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

তখন কারা গ্রন্থাগারে যেসব বইপত্র ছিল, তার বড় একটি অংশ আসলে রাজবন্দিদের রেখে যাওয়া। অনেক বইতে তাদের স্বাক্ষরও ছিল। নাম দেখে কয়েকজন বিখ্যাত রাজবন্দিকে আমরা চিনতেও পেরেছিলাম; কিন্তু এতদিন পর আর সেই নামগুলো মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে, সেসব বই পড়ার সময় আমরা রোমাঞ্চিত হতাম। মনে হতো, এই বই তিনিও পড়েছেন, পাতা উল্টেছেন। না চেনা না জানা কত রাজবন্দির ছোঁয়া লেগে আছে এর পাতায় পাতায়! কারা গ্রন্থাগারের বইগুলোর বিষয়বস্তুও ছিল বিচিত্র– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মালোচনা, অপরাধবিজ্ঞান, এমনকি কারাগারের স্মৃতি নিয়ে লেখা বইও ছিল।

একটি বই ছিল রেলইঞ্জিন নিয়ে। ব্রিটিশরা কালেকটরেট ও কারাগারের পরপরই রেললাইন স্থাপনে মনোযোগী হয়েছিল। তাদের যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার জন্য। তারও আগে ইউরোপে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়েছিল। একটি বই ছিল, যেখানে রেলইঞ্জিনকে বলা হয়েছে 'যন্ত্রদানব'। বইটি ছিল কৌতূহলোদ্দীপক।

কারা গ্রন্থাগারে বই খুঁজতে গিয়ে আমি আরেকটি কাজ করতাম, কোনটি সবচেয়ে পুরনো বই। দেখার চেষ্টা করেছি, তখনকার সমাজ ও ভাষা কেমন ছিল। দেখেছি, পুরনো বইগুলো সাধু ভাষায় লেখা। বাক্য গঠনও ভিন্ন। গত তিন শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কী বিবর্তন ঘটেছে, কারাগারের বইগুলো তার সাক্ষী। অন্যান্য ভাষার বইও চোখে পড়েছে। কারণ কারাগারে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও রাজবন্দিরা আসতেন।

কারা গ্রন্থাগারের বই আনা ও পড়াসূত্রে অনেক মধুর মানবিক স্মৃতিও তৈরি হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তাদের কাজ দেওয়া হতো কারা গ্রন্থাগারে। তাদের বলা হতো রাইটার। তাদের সঙ্গেই রাজবন্দিদের যোগাযোগ হতো। তারা ক্যাটালগ নিয়ে আসতেন। তাদের আসার জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম। তাদের আগমন মানেই নতুন বিষয়ের বই হাতে পাওয়া। বই আনা ও পড়াসূত্রে তাদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। বই নিতে নিতে তারাও বুঝে ফেলতেন, কী ধরনের বই পড়তে পছন্দ করি আমি। সে ধরনের কিছু বই তারাও আগে থেকে হাতের কাছে রেখে দিতেন বা নাম বলতেন। তাদের নাম ভুলে গেছি, কিন্তু মুখাবয়ব ও টুকরো টুকরো ঘটনা এখনও উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। এখন পেছনে তাকালে বুঝতে পারি, কারাভোগের সেই সময়ে লাইব্রেরির স্নিগ্ধ সাহচর্য পেয়েছিলাম বলেই কারাগারের দুঃসময়কে ততটা দুঃসহ মনে হয়নি।

আমরা চেয়েছিলাম, সব বন্দিই কারা গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভ করুক। মনে আছে, এ নিয়ে আমরা দুই দফা আন্দোলন করেছিলাম। খুব সম্ভবত ১৯৭৭ সালে একবার ও ১৯৭৮ সালে একবার। কারাভ্যন্তরে আন্দোলনের প্রধান রূপ অনশন। দুটি অনশনই ছিল নয় দিনের। আমাদের সঙ্গে পুরো কারাগার যোগ গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছিল। অবশ্য বই পড়ার সুযোগ ছাড়াও অন্যান্য আরও দাবি সেখানে ছিল। যেমন বন্দিরা যেন ১ ব্যান্ডের ট্রানজিস্টার রাখতে পারে। তখন কারাগারে বন্দি ছিলেন বিপ্লবী রবি নিয়োগী। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমরা বহুবার আন্দোলন করেও যা অর্জন করতে পারিনি, তোমরা তা পারলে।

দ্বিতীয়বার কারাগারে গিয়েই দুঃসময় অগ্রাহ্য করতে বইয়ের সাহচর্য চেয়েছি আমি। আমার 'কাঠগড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি' বইয়ে এ সংক্রান্ত অনেক উল্লেখ রয়েছে। যেমন ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ডেটলাইনে লিখেছি– "জেলখানার লাইব্রেরি থেকে নেয়া সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'কাঁদো নদী কাঁদো' শেষ করেছি। শেষ কয়েকটি পাতা নেই। বেশ পুরাতন বইটি। লেখকের 'লালসালু' ও 'চাঁদের অমাবস্যা' আগেই পড়েছি। মানুষের মনের নিগূঢ়, জটিল, রহস্যময়তা এই উপন্যাসেও আছে। এডওয়ার্ড সাইদের লেখা 'কালচার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম' বইটি পড়া শুরু করেছি। ৪ সেপ্টেম্বর কোর্টে অংকুর বইটি দেয়। লিখেছে ২০ সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন উপলক্ষে উপহার হিসেবে সে বইটি কিনেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামাডোল ও পরে আমার গ্রেফতার এসব কারণে আর দিতে পারেনি। শেষ করেছে এই বলে– 'স্টে স্ট্রং'।

দ্বিতীয় দফা কারাগারে গিয়েও একইভাবে রাইটাররা কারা গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ নিয়ে আসতো। উসকে দিত পুরানো অনেক স্মৃতি, অনেক মুখ। ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ডেটলাইনে লিখেছি– 'কারা লাইব্রেরির ক্যাটালগ নিয়ে এসেছিল কর্মরত কয়েদি। বেশ অনেকগুলো বইয়ের নাম দিলাম। এর মধ্যে মাত্র দুটো বই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'দুধভাতে উৎপাত' প্াওয়া গেল।"

আমার কারাবাসের সময়ই কারাগার সংস্কারে গঠিত হয়েছিল বিচারপতি মুনীর কমিশন। তখন আমি ময়মনসিংহ জেলে। রাজবন্দিদের কাছে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়ে উত্তর চাওয়া হয়েছিল। আমার সঙ্গে তখন জেলে ছিলেন সিরাজুল আলম খানও। তিনিই উৎসাহ দিয়েছিলেন উত্তর লিখতে। তার মতামতও দিয়েছিলেন। আমি দু'জনের মতামতই লিখে পাঠিয়েছিলাম উত্তর হিসেবে। সেখানেও কারা গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট মতামত ছিল। পরে জেনেছি, রাজবন্দিদের কাছ থেকে পাওয়া আমার উত্তরটিই ছিল সবচেয়ে পরিপূর্ণ মতামত।

সত্যি বলতে কি, ২০০৭ সালে আমাকে যখন ফের কারাগারে নেওয়া হয়, তখন খানিকটা আশ্বস্ত ছিলাম এই ভেবে যে, সেখানে কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু গিয়ে খুবই বেদনাহত হয়েছিলাম। ১৯৭৬ সালে গ্রন্থাগার যেমন গোছানো, পরিপাটি, হালনাগাদ ক্যাটালগে সমৃদ্ধ ছিল, তা আর নেই। বেশিরভাগ বইয়ের দশাও করুণ– পাতা নষ্ট, বাঁধাই ড্যাম্প; কোনো কোনো বই উইপোকা খাওয়া। আরেকটি বিষয় খুবই কষ্ট দিয়েছে, মাঝখানে মাঝখানে বইয়ের পাতা কাটা! ব্রিটিশরা যদিও ঔপনিবেশিক শাসক ছিল, কারাগারে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তৈরির সভ্যতা ও মনন তাদের ছিল। কেবল গ্রন্থাগার তৈরি নয়, তা সংরক্ষণ ও পুস্তকে সমৃদ্ধ করার মহৎ চিন্তাও তাদের মধ্যে ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি যে গ্রন্থাগার তৈরি ও কয়েক শতক সংরক্ষণ করেছে, স্বাধীনতার পর কয়েক দশকে আমরা তা নষ্ট করে ফেলেছি! ওই গ্রন্থাগার ও বই একটি জীবন্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাস আমরা মুছে যেতে দিয়েছি!

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ডেটলাইনে আমার বইতে লিখেছিলাম– 'ফেরার পথে কারাগার লাইব্রেরি দেখতে গেলাম। লাইব্রেরির দুরবস্থা দেখে মন খুব খারাপ হলো। কত প্রাচীন এই লাইব্রেরি! মনে হল, বাংলাদেশ হওয়ার পর এর দীনদশা শুধু বেড়েছেই। সেই ব্রিটিশ বা পাকিস্তানি আমলে রাজবন্দিরা আসতেন, বই রেখে যেতেন। কিন্তু ১৯৯০-এর পর থেকে কারাগারে রাজবিন্দ তো তেমন ছিল না। আর এখনকার রাজবন্দিরা অনেকেই দুর্নীতিবাজ বন্দি। বইয়ের কদর তো তারা জানে না।'

২০০৭ সালের আগস্ট থেকে ২০০৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ মাস সময়ে তারপরও নানা সুযোগে লাইব্রেরিতে গিয়েছি। সংবাদমাধ্যমে দেখছি, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে 'আধুনিক' কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত হচ্ছে। সেখানে থাকার পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা সবই আগের তুলনায় উন্নত। কিন্তু সেখানে একটি ভালো গ্রন্থাগার থাকবে কি-না, সেই খবর কোথাও নেই। কোথাও নেই যে ইতিমধ্যে জরাগ্রস্ত ও শতাব্দীর সাক্ষী গ্রন্থাগারটিকে সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হবে কি-না। আমার আকাঙ্ক্ষা হয়, আবার কারাগারে যাই। যদি তা হয়, তবে লাইব্রেরিতে কাজ যেন পাই। ওই লাইব্রেরিটিকে যত্নের সঙ্গে সংস্কার ও সংরক্ষণে কাজ করে যেতাম!

অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়